শিল্পকে অবশ্যই হতে হবে ক্রিয়াশীল

মূল নিবন্ধ : ব্ল্যাক স্মিথ

বাংলা ভাষান্তর : মোস্তাফিজুর রহমান জাভেদ

[প্রখ্যাত চিন্তক ও শিল্প-সমালোচক হ্যারল্ড রোজেনবার্গের চিন্তাকাঠামো ও 'আমেরিকান পেইন্টারস' গ্রন্থে প্রতিফলিত শিল্পদর্শন সম্প্রতি পুনরায় আলোচনার পাদপ্রদীপে আসা এবং এর সামগ্রিক দিক নিয়ে ব্ল্যাক স্মিথের আলোচনা]

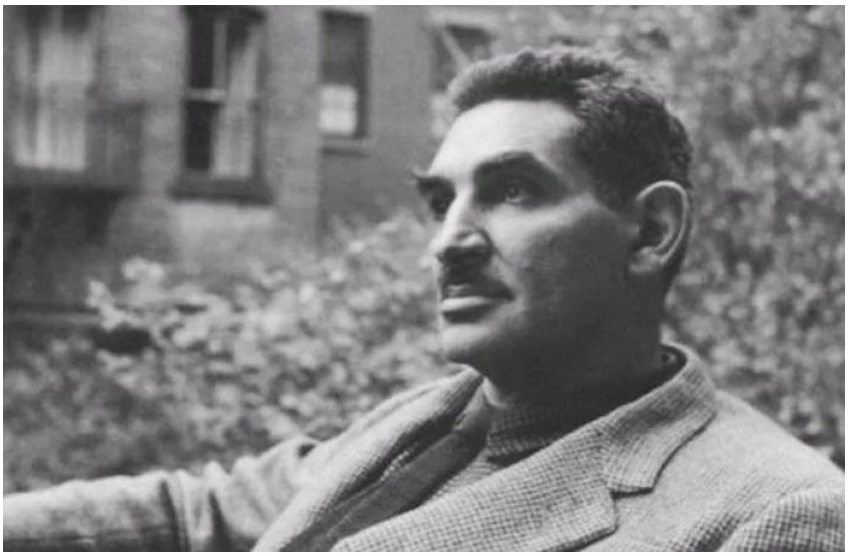

হ্যারল্ড রোজেনবার্গ : সমাজ-চিন্তক ও শিল্প-সমালোচক (১৯০৬-১৯৭৮)

. . .

মানুষ আজ স্বাভাবিক কারণেই রাজনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং গণমাধ্যমের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। রাজনীতি বা সংস্কৃতিতে আর কোনো অগ্রগতি সম্ভব বলে মনে হয় না। বিশাল ও নির্লিপ্ত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো, পুঁজিবাদী বাজারের মোহময় প্রলোভন, এবং রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচারিত মতাদর্শ... এই সবকিছু মিলেই আমাদের চারপাশ ভরে দিচ্ছে বিভ্রান্তিকর ক্লিশে ও ভুয়া পরিচয়ে। **আমরা সত্যকে আর আলাদা করে চিনতে পারছি না, তা একে অপরের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি না কিংবা এমন কোনো সত্যিকারের ভূমিকাও খুঁজে পাচ্ছি না যার ভেতর দিয়ে অন্যদের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা যায়,** এবং সেইসব শক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়, যেগুলো আমাদের প্রকৃত কর্মশক্তিকে চিন্তাহীন অনুগত্যে বা আত্মপ্রবঞ্চনামূলক প্রদর্শনীতে পরিণত করে।

ঠিক এই যুক্তিটিই তুলে ধরেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটময় সময় থেকে শুরু করে ১৯৭০-এর দশকে তাঁদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত—মধ্য শতাব্দীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক হ্যারল্ড রোজেনবার্গ ও হানা আরেন্ট। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কেবল ব্যক্তিগত ছিল না; এই সম্পর্ক থেকেই জন্ম নেয় এক গভীর ও চলমান বৌদ্ধিক সংলাপ,— বিশেষ করে কার্য (action) ও বিচার-এর (judgment) ধারণাকে ঘিরে। এই দীর্ঘ কথোপকথনের প্রভাবে দু'জনেই ধীরে ধীরে নিজেদের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে কথা বলা সাংস্কৃতিক সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। **আজ হানা আরেন্ট আধুনিক দর্শনের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রোজেনবার্গ প্রায় বিস্মৃত এক নাম; এমনকি দুজনের মধ্যে যে-গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ বৌদ্ধিক সংলাপ চলেছিল, সেটিও আজ প্রায় হারিয়ে গেছে।**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে ছাপিয়ে বিশ্বের শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিল, তখন রোজেনবার্গ ছিলেন আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-চিন্তক। তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলোর বড় অবদান ছিল এই-যে— বার্নেট নিউম্যান, উইলেম দে কুনিং এবং জ্যাকসন পোলকের মতো শিল্পীরা শিল্প-ইতিহাসে স্থায়ী জায়গা করে নেন, আর আধুনিক শিল্প ধীরে ধীরে আমেরিকান সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়ে পরিণত হয়। **রোজেনবার্গ যেমন আরেন্টকে প্রভাবিত করেছিলেন, তেমনি আরেন্টও তাঁর চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন।** ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে তাঁদের বন্ধুত্ব শুরু হয়, এবং সেই সম্পর্কের ভেতর থেকে দুজনে মিলে 'অ্যাকশন' নামক ধারণাটি গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে নান্দনিকতা ও রাজনীতির মধ্যকার গভীর সম্পর্ককে নতুনভাবে বোঝার চেষ্টা করেন তাঁরা। পরবর্তী দুই দশক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের *Committee on Social Thought*–এ পাঠদানের সময়জুড়ে দু'জনেই বারবার এই ধারণাটির অর্থ নতুন করে ভেবে দেখেছেন,— **অ্যাকশন আসলে কী, এবং আধুনিক সমাজে তার সম্ভাবনা কোথায়।**

মৃত্যুর চার দশক পেরিয়ে রোজেনবার্গ যদিও প্রায় বিস্মৃত নামে পরিণত হয়েছেন। তাঁর যে-স্বতন্ত্র 'অ্যাকশন'-এর ধারণা, যা ছিল অ-প্রাতিষ্ঠানিক, সদা-পরিবর্তনশীল, এবং যেগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর এমন সব প্রবন্ধে, যা ১৯৮০-র দশকের পরে আর ছাপা হয়নি... সেগুলোকে মাইকেল ফ্রাইড, রোজালিন্ড ক্রাউস ও হাল ফস্টারের মতো শিল্প-ইতিহাসবিদরা একরকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁদের চোখে এসব ছিল 'অর্ধেক রোমান্টিক, অর্ধেক ক্ষুদ্র বুর্জোয়া ভাবনা' কিংবা 'একধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিলাপ';— যেমনটি ক্রিস্টা নোয়েল রবিনস তাঁর *Artist as Author* (২০২১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই পণ্ডিতেরা রোজেনবার্গকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে ভুল করেছেন, তবে তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন,— রোজেনবার্গ তাঁদের নিজস্ব সমালোচনার ধরণের এক গভীর বিরোধী ছিলেন। কারণ রোজেনবার্গের লেখাগুলো ধারালো ভাষায় আক্রমণ করেছিল সেই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জাদুঘরকর্মী, গ্যালারি মালিক ও শিল্পসমালোচকরা শিল্পকর্মকে হয় শিক্ষাদানের উপকরণ নয়তো বাজারের পণ্যে পরিণত করেন। **এর ফলে শিল্প সৃষ্টির আসল প্রশ্নগুলো, অর্থাৎ মানুষ কীভাবে বাঁচে, কীভাবে নিজের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে ইত্যাদি আড়ালে পড়ে যায়।**

রোজেনবার্গ যেসব শিল্পীকে নিয়ে লিখেছিলেন, তিনি তাঁদেরকে দেখেছেন এমন মানুষ হিসেবে যাঁরা পুঁজিবাদের নিপীড়ন ও বিভ্রমের মাঝেও নিজের জন্য এক মানবিক জীবন গড়ার সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন। এই সংগ্রামের মধ্যেই, তিনি যুক্তি দেন, তাঁরা শিল্প-ইতিহাসের প্রচলিত ধারা ভেঙে ফেলেছিলেন। সুন্দর বস্তু তৈরি করা, সচেতনভাবে কোনো আঁভ-গার্দ দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা, এমনকি মৌলিকত্বের খোঁজ করাটাও তাঁদের কাছে গৌণ হয়ে গিয়েছিল। **কারণ, তাঁরা আর 'শিল্প তৈরি' করছিলেন না, বরং কর্ম (action) করছিলেন;— হোক তা ক্যানভাসে, ভাস্কর্যে, অথবা তাদের কাজ যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত তাকে মাধ্যম করে।**

রোজেনবার্গ তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা প্রবন্ধ *The American Action Painters*-এ (১৯৫২) জোর দিয়ে বলেছিলেন,— এ-ধরনের *action-এর* প্রতিক্রিয়ায় শিল্প-সমালোচনাই সবচেয়ে অনুপযুক্ত প্রতিক্রিয়া। **তিনি ঘোষণা করেন : 'নতুন চিত্রকলা শিল্প ও জীবনের সব বিভাজন ভেঙে দিয়েছে।'** বিশেষজ্ঞদের মূল্য-অনুসন্ধানী সমালোচনা এটি চায় না। এটি বরং অস্তিত্বগত (existential) বিচারকে চায়;— একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা শিল্পীর কাজকে তার জীবনের প্রকাশ হিসেবে দেখছে। কোনো চিত্রকর্মকে ইতিহাসের ধারায় কোথায় রাখা যায় কিংবা সমাজতাত্ত্বিক সমস্যার ওপর তা কীভাবে আলোকপাত করতে পারে,— এসব নির্ণয় করার চেয়ে সমালোচকের কাজ হলো এইটা বিচার করা-যে,— **শিল্পীর action তাঁর জীবনকে কীভাবে উন্মোচিত করে।**

রোজেনবার্গের জীবন, যা ২০২১ সালে ডেবরা ব্রিকার বালকেনের জীবনীগ্রন্থের কারণে এখন ভালোভাবে জানা যায়, শুরু হয়েছিল নিউ ইয়র্কে ১৯০৬ সনে এক নিম্নমধ্যবিত্ত ইহুদি পরিবারে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও অস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে চলা রোজেনবার্গ আইনশাস্ত্র পড়ার পর (তিনি কখনো আইনজীবীর ভূমিকায় আদালতে হাজির হননি) ঘুরে বেড়াতেন

গ্রিনউইচ ভিলেজের বোহেমিয়ান সমাজে। **তরুণ শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে পরিচিত হন তাঁর সময়ের প্রধান ধারা 'মার্কসবাদ, মনোবিশ্লেষণ ও পরাবাস্তববাদ ওরফে সুররিয়ালিজম'-এর সাথে।** রোজেনবার্গের সৃজনশীল কার্যকলাপ ছিল তাঁর বৌদ্ধিক পরিবেশের মতোই বৈচিত্র্যময়। ১৯৩০-এর দশকের অধিকাংশ সময় তিনি অস্থির ঘুরে বেড়িয়েছেন চিত্রকলা, কবিতা, কথাসাহিত্য আর প্রবন্ধের জগতে। এসব প্রয়াসে ছিল বামপন্থী রাজনীতির ছাপ। যেমন, তাঁর কবিতা *The Front*-এ (১৯৩৫) দেখা যায় আধুনিকতাবাদী বহুমাত্রিক শৈলী আয়ত্ত করার সংগ্রাম করছেন তিনি, যেখানে নাবিক, ইউনিয়ন সদস্য আর কৃষকদের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে চালানো সহিংসতাকে উদ্‌যাপন করছেন তিনি, যা প্রতীকায়িত হয়েছে 'একজন ব্যবসায়িক বদমাশ'-র মধ্যে।

১৯২৯ সালের মহামন্দা যখন এক যুগনির্ধারণী বিপর্যয়ে পরিণত হলো, রোজেনবার্গও অনেক তরুণ চিন্তকের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নে খুঁজে পেলেন নতুন ধরনের সমাজব্যবস্থার অনুপ্রেরণা। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত সরকার কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলোকে উৎসাহিত করেছিল বিশ্বের সর্বত্র, **যাতে তারা কমিউনিস্ট নয় এমন গণতান্ত্রিক বামপন্থীদের সহযোগিতা করে, যা ছিল তথাকথিত *Popular Front* নীতি।** রোজেনবার্গ এরকম একাধিক সংগঠনে যোগ দেন। *Art Front-এর* সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন সেইসময়, যা ছিল দুটি কমিউনিস্ট পার্টি মিলে গঠিত শিল্পী ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত একটি পত্রিকা।

নিউ ডিল যুগের একাধিক সরকারি কর্মসূচিতেও তিনি অংশ নেন, যেগুলো লেখক ও শিল্পীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে চালু হয়েছিল। *WPA (Works Progress Administration)*-এর অর্থায়নে আঁকা দেওয়ালচিত্র নিয়ে ক্যাটালগ ও অন্যান্য লেখা লিখেছিলেন রোজেনবার্গ, এবং *ফেডারেল রাইটার্স প্রজেক্টের* আওতায় বেরুনো *American Stuff*, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন লেখালেখি একত্র করা হতো,— এর সম্পাদনায় ছিলেন সক্রিয়। **সেইসময় এটি কল্পনা করাই যেত,— শিল্পী, লেখক, আমেরিকান বামপন্থা, রুজভেল্ট প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের মধ্যে একধরনের অংশীদারিত্ব গড়ে উঠছে।**

১৯৩০-র শেষ দিকটায় এসে রোজেনবার্গ সমন্বয়ের ধারণা পুরোপুরি ত্যাগ করেন। বামপন্থীদের অনেকের মতো তিনিও সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা ঘটনায় গভীরভাবে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। মিথ্যা বিচার ও নির্মম দমন-পীড়ন, নাৎসি জার্মানির সঙ্গে চুক্তি, এবং ফিনল্যান্ডে সামরিক আগ্রাসন তাঁর বিশ্বাস ভেঙে দেয়। **একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পজগতের ওপর তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেন স্টালিনবাদী অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠা কর্মীদের সংকীর্ণ ও কঠোর মতাদর্শিক আচরণ দেখে।** *WPA-র* অর্থায়নে তৈরি শিল্পকর্মগুলো তাঁকে আশাহত করে তোলে। সেখানে যে-বীরত্বপূর্ণ কৃষক ও শ্রমিকদের দেয়ালচিত্র আঁকা হচ্ছিল, সেগুলোর সঙ্গে স্টালিন কিংবা হিটলারের শাসনামলে প্রচারিত শিল্পের আশ্চর্য মিল তিনি লক্ষ করেন। ফলে রাজনীতি ও নান্দনিকতা উভয় ক্ষেত্রেই *Popular Front* যেন একপ্রকার মৃত প্রান্তে এসে পৌঁছেছে বলে তাঁর মনে হতে থাকে।

রোজেনবার্গের ঘনিষ্ঠ শিল্পী মহলেও একইধরনের ভাঙন ও হতাশার অনুভূত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৩০-এর দশকে তাঁর অন্যতম কাছের বন্ধু ছিলেন বার্নেট নিউম্যান (১৯০৫-১৯৭০)। নিউম্যান তখন দিনের বেলায় পাবলিক স্কুলে বিকল্প শিক্ষকতা করতেন, আর অবসরে ছবি আঁকতেন। রোজেনবার্গের মতো তিনিও ছিলেন মার্কসবাদী, তবে ক্রমশ তিনি আরও মুক্তচিন্তার দিকে ঝুঁকছিলেন। **১৯৩৩ সালে নিউম্যান নিউইয়র্ক সিটির স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান। তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন,— 'সংস্কৃতিমনা মানুষ', অর্থাৎ তাঁর মতো শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরাই সমাজে আনতে পারেন প্রকৃত 'অ্যাকশন'। এই শব্দটিই পরে রোজেনবার্গের চিন্তায় এক কেন্দ্রীয় ধারণা হয়ে ওঠে।**

নিউম্যানের বিশ্বাস ছিল, যাদের নান্দনিক অভিজ্ঞতা গ্রহণের ক্ষমতা আছে, তাদের উচিত একত্র হয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো;— সম্পদ ও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে থাকা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল বিনামূল্যের শিল্পবিদ্যালয়, একটি নাগরিক ও বাণিজ্যিক লাভালাভের বাইরে সক্রিয় চলচ্চিত্র স্টুডিও, এবং আরও নানা সৃজনশীল

উদ্যোগ। **কিন্তু দশকের শেষ দিকে এসে নিউম্যান বামপন্থী রাজনীতি ও রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত শিল্প— উভয়ের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন।** এইসময়ে তিনি এমন এক গভীর মানসিক ও দার্শনিক রূপান্তরের ভিতর দিয়ে গমন করেন, যা রোজেনবার্গকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। **নিউম্যান তাঁর আগের সব চিত্রকর্ম ধ্বংস করে দেন এবং একেবারে নতুন এক শিল্পভাষার খোঁজে নামেন।** উক্ত অনুসন্ধান শেষপর্যন্ত তাঁকে ১৯৪৮ সনে তাঁর বিখ্যাত বিমূর্ত শিল্পকর্ম *Onement I*-এর দিকে নিয়ে যায়।

তবু, নিউম্যান পরে স্মরণ করেছিলেন— সংকটের পুরো সময়জুড়ে রোজেনবার্গ নতুন শৈলীকে 'ব্যাখ্যা করার জন্য' তাঁকে বারবার চাপ দিতেন। **কোনো চিত্র, কোনো প্রতীক ছাড়াই আঁকার এই নতুন ধরনটি 'বিশ্বের কাছে কী অর্থ বহন করতে পারে?'— এ-প্রশ্ন রোজেনবার্গ বারবার তুলতেন তখন।** বাহ্যিকভাবে বিমূর্ত চিত্রকলায় রাজনীতির কোনো উপস্থিতি না থাকলেও, তা ছিল এক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া; বিশেষ করে যখন অগ্রগতিশীল বামপন্থার আশা ভেঙে পড়েছিল এবং রাজনীতি স্থবির হয়ে গিয়েছিল।

নিউম্যান রোজেনবার্গকে বলেছিলেন, যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তার শিল্পকর্ম মানে দাঁড়ায় 'সব ধরনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সর্বগ্রাসী শাসনের অবসান।' অর্থাৎ, তাঁর ছবির রাজনৈতিক তাৎপর্য কিংবা বার্তা বোঝার জন্য রোজেনবার্গের মতো সহানুভূতিশীল কোনো চিন্তকের সাহায্য যতই প্রয়োজন হোক-না-কেন, নিউম্যানের চিত্রকলা তখনও একধরনের রাজনৈতিক কর্ম হিসেবে টিকে ছিল। **এইসময় দু'জন বন্ধু একসঙ্গে নিজেদের মতাদর্শগত নিশ্চয়তা হারানোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন,** সেই প্রক্রিয়ায় রোজেনবার্গ একদিকে নিউম্যানকে একটি সম্পূর্ণ নতুন শিল্পপদ্ধতির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছিলেন, আর অন্যদিকে তিনি নিজেও শিল্পসমালোচক হিসেবে ধীরে ধীরে নিজের একটি নতুন পরিচয় গড়ে তুলছিলেন।

চিত্র : বার্নেট নিউম্যানের *Onement I* (১৯৪৮)

১৯৪০-এর দশকজুড়ে, একদিকে যখন রোজেনবার্গ নিউম্যানকে বিমূর্ত শিল্পীর এক নতুন সত্তায় রূপ নিতে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর নিজের মনে গভীর সন্দেহ দানা বাঁধছিল;— **এইসময়ে কি সত্যিকার অর্থে কোনো ফলপ্রসূ রাজনৈতিক কর্ম সম্ভব?** তাঁর আশঙ্কা ছিল, রাজনৈতিক অগ্রগতি ব্যর্থ হচ্ছে মূলত এই কারণে-যে, মানুষ ক্রমে নতুন ধরনের আকর্ষণীয় 'ব্যক্তিত্ব' বা পরিচয়ের মোহে আটকে পড়ছে। এইসময় তিনি প্রধানত লিখছিলেন ছোট পরিসরে

প্রকাশিত হলেও অত্যন্ত প্রভাবশালী ট্রটস্কিপন্থী সাময়িকী *Partisan Review*-এ। সেখানে তিনি যুক্তি দেন,— তাঁর মতো 'সাবেক কমিউনিস্ট' বুদ্ধিজীবীরা যখন বামপন্থা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন, তাঁরা এতটাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন 'বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির মুখে', যে-কোনো 'ধর্মীয় বা পৌরাণিক প্রতীক' আঁকড়ে ধরছিলেন কেবল এই ভ্রমে-যে,— এর মাধ্যমে নিজের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত ও তাঁরা আসলেই কারা তা বুঝতে পারবেন।

এভাবে বিভ্রান্ত মানুষ, যারা অনুভব করছিলেন আধুনিক সমাজে কিছু ভয়াবহ সমস্যা রয়েছে কিন্তু তা ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না, আরও কম পারছিলেন এর থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে নিতে,— **তারা কল্পিত পরিচয় ধারণ করছিলেন তখন :**— কেউ আর্য হয়ে উঠছিল, কেউ নতুন সোভিয়েত মানুষ, কেউ আবার পশ্চিমা সভ্যতার রক্ষক। এই নাটকগুলো কখনো বসানো হতো সুদূর অতীতে, কখনো-বা কল্পিত ইউটোপীয় ভবিষ্যতে। **এসব পরিচয় ও কাহিনি যদিও ছিল মিথ্যা, তবু অন্তত এগুলো ছিল সহজে বোঝার মতো।** এগুলো এক ধরনের চিত্রনাট্যের জোগান দিতো। বিভ্রান্ত মানুষকে জানিয়ে দিত তারা কারা, কী করা উচিত, এবং সেইসূত্রে তাদের মনে একধরনের ক্রিয়াশীলতার অনুভূতিও তৈরি হতো।

রোজেনবার্গ এই বিশ্লেষণটি তুলে ধরেন কার্ল মার্ক্সের *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (১৮৫২)-এর পুনরায় ব্যাখ্যা করা একাধিক প্রবন্ধে। আরেন্টের *The Origins of Totalitarianism* (১৯৫১)-এ বিকশিত ধারণাকে এটি প্রতিধ্বনি করছিল। দুজনেই যুক্তি দেন,— ডানপন্থী ও বামপন্থী উভয় চরমপন্থী মতাদর্শ আধুনিক সমাজের প্রকৃত সমস্যার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে ভুয়া সামষ্টিক পরিচয় ও কাহিনির মাধ্যমে, যা প্রকৃত কর্মকাণ্ড ও সত্যিকারের আত্মসত্তার বিকল্প হিসেবে হাজির হয়। **তাঁরা সতর্ক করেছিলেন, এসব মতাদর্শের বিরোধী উদারপন্থীরাও এসব বিভ্রমের বাইরে নন।** রোজেনবার্গ তো ক্রমে সন্দেহ করতে শুরু করেন *Partisan Review–এর* মতো লিটল ম্যাগাজিনগুলি এবং স্টালিন পরবর্তী নিউইয়র্কের বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডল আসলে ঠিক এই ধরনের ভুল ভাবনার প্রচারক। **এমনকি যাঁরা নিজেকে মুক্তচিন্তক বলে মনে করতেন, রোজেনবার্গের মতে তারা অনেকসময়ই ছিলেন স্টালিন ও হিটলারের প্রচারণায় মগ্ন সাধারণ মানুষের মতোই বিভ্রান্ত।**

১৯৪৮ সনে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ *The Herd of Independent Minds*-এ রোজেনবার্গ *Partisan Review*-সহ বেশ কিছু প্রকাশনার কঠোর সমালোচনা করেন। **কারণ, তারা নিজেদের এমনভাবে উপস্থাপন করছিল যেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী গণসংস্কৃতি থেকে আলাদা, এবং এক উচ্চতর সাংস্কৃতিক-মানসিক জগতের প্রতিনিধি।** *Partisan Review*-এর লেখক ক্লেমেন্ট গ্রিনবার্গ ও ডোয়াইট ম্যাকডোনাল্ড নিয়মিত অভিযোগ করতেন ভোগবাদী, ভোগসুখে ডুবে থাকা এবং নিম্নমানের বিনোদনশিল্প একদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক মান নামিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। এই উদ্বেগগুলোর সঙ্গে রোজেনবার্গ অনেকাংশে একমত ছিলেন। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন,— সমস্যা এখানেই শেষ নয়। রোজেনবার্গের মতে, এই ধরনের পত্রিকাগুলো এমন একটি ভ্রান্ত ধারণাকে লালন করছে, যেন তারা গণমাধ্যমের মাধ্যমে জনমত তৈরির মানক প্রক্রিয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তারচেয়ে শ্রেষ্ঠ। **বাস্তবে তারা ছিল সেই বিশাল মত-নির্মাণ প্রক্রিয়ার একটি ক্ষুদ্র উপগোষ্ঠী,** এবং সম্ভবত আরও সহজেই বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য, কারণ তারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে স্বাধীন বলে বিশ্বাস করত। এইভাবে, নিজেদের মুক্তচিন্তার মুখোশ পরে তারা প্রচার করছিল আত্মতুষ্ট আনুগত্য;— এক ধরনের আত্মবিভ্রম। রোজেনবার্গ সতর্ক করেছিলেন : এই লিটল ম্যাগাজিনগুলো ধীরে ধীরে এমন এক দ্বিধাগ্রস্ত উদারপন্থায় ভেসে যাচ্ছে, যা প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক বা রাজনৈতিক কর্মের বদলে নিরাপদ, আরামদায়ক, নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি পরিচয় সৃষ্টি করছিল।

এই গভীর হতাশার অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত রোজেনবার্গের শিল্পসমালোচক হিসেবে আত্মপ্রকাশে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। ১৯৫২ সালে *ArtNews*–এ প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ *The American Action Painters* তাঁকে এই নতুন পরিচয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক সেইসময়ে, যখন নিউইয়র্ক ভিত্তিক বিমূর্ত শিল্পী

বার্নেট নিউম্যান, উইলেম দে কুনিং, জ্যাকসন পোলক নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। **এই লেখায় রোজেনবার্গ একটি বড়ো দাবি করেন। তাঁর মতে, শিল্পীরা কেবল আলাদা কিছুর স্রষ্টা নন। তাঁরা আসলে ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকের 'মহা সংকট' পরবর্তী সময়ের মানুষের অভিজ্ঞতার প্রতীক।** সেইসময় রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ বদলের আশা যেমন ভেঙে পড়েছিল, তেমনি আধুনিকতাবাদী শিল্পের ধারাবাহিক উদ্ভাবনের ওপর দাঁড়িয়ে অগ্রগতির যে-বিশ্বাস ছিল, সেটিও টেকেনি। শুধু রাজনীতি নয়, শিল্প নিজেই যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। শিল্প আসলে কী উদ্দেশ্যে তৈরি হবে, সেটাও আর পরিষ্কার ছিল না। এই পরিস্থিতিতে নতুন চিত্রকলার সমর্থকরা একধরনের মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তারা রাজনীতি এবং নন্দনতত্ত্ব দুটোকেই একপাশে সরিয়ে রাখেন। সমাজ বদলানোর লক্ষ্যে শিল্প সৃষ্টি করা, কিংবা সুন্দর, অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু নির্মাণের প্রচলিত লক্ষ্যগুলো তাঁদের কাছে আর মুখ্য ছিল না। তার বদলে তাঁরা শুরু করেন এক ভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা। **রোজেনবার্গ এই প্রচেষ্টাকে বর্ণনা করেন 'নৈতিক ও বৌদ্ধিক ক্লান্তির এক মরিয়া স্বীকারোক্তি' হিসেবে।** এই ক্লান্তি থেকে জন্ম নেয় ব্যক্তিগত বিদ্রোহ। এক ধরনের কর্ম, যেখানে শিল্প আর কেবল একটি বস্তু নয়, বরং হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত বিপ্লব।

দৃশ্যশিল্পের ক্ষেত্রে এই নতুন শিল্পীদের অবস্থান অনেকটাই ছিল সেরকম, যেমনটা ছিল ফরাসি সাহিত্য ও দর্শনের অস্তিত্ববাদীদের। রোজেনবার্গ এই ধারার সঙ্গে খুব কাছ থেকে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিয়মিত লিখতেন জাঁ-পল সার্ত্র ও সিমোন দ্য বোভোয়ার সম্পাদিত সাময়িকী *Les Temps moderns*-এ, যেখানে *The American Action Painters* প্রবন্ধটির একটি প্রাথমিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রোজেনবার্গ তাঁর ফরাসি অস্তিত্ববাদী সহচরদের থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা ছিলেন। অস্তিত্ববাদীরা সাধারণত শিল্প বা মানবিক সিদ্ধান্তকে বিচার করতেন আত্ম-সত্যতা বা 'নিজের প্রতি সৎ থাকা'র মানদণ্ড আরোপ করে। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি তার বেছে নেওয়া পথের প্রতি কতটা আন্তরিক বা দায়বদ্ধ সেটি তাদের কাছে মুখ্য ছিল। রোজেনবার্গ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তাঁর মতে, বিষয়টি কোনো ব্যক্তিগত সততার পরীক্ষা নয়, কিংবা ইচ্ছামতো নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত থাকার প্রশ্নও নয়। **তিনি যখন এই ধরনের শিল্পচর্চাকে 'অ্যাকশন' বলে অভিহিত করেন, তখন তাঁর জোর ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায়।** তাঁর কাছে আসল প্রশ্ন ছিল,— এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাস্তবে কতটা কার্যকরভাবে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে বদলাতে পারে, এবং একইসঙ্গে শিল্পীর নিজের জীবন ও চরিত্রকে কতটা রূপান্তরিত করতে পারে। এই পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতাই রোজেনবার্গের কাছে শিল্পের প্রকৃত বিচার।

রোজেনবার্গ যেসব আমেরিকান শিল্প কে নিয়ে লিখছিলেন, তাঁদে কে তিনি উদযাপন করছিলেন এমন কিন্তু নয়। লক্ষণীয়-যে তিনি তাঁদের কারও নাম উল্লেখ করেননি কিংবা কোনো নির্দিষ্ট শিল্পকর্ম বর্ণনাও করেননি। তা-সত্ত্বেও তাঁর সমসাময়িকরা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন-যে তিনি নিউইয়র্কের শীর্ষ বিমূর্ত শিল্পীদের কথাই বলছেন। কারণ, রোজেনবার্গের নিউম্যান ও দে কুনিং-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল সুপরিচিত। এও সত্য, বিমূর্ত শিল্পীদের তিনি একাই গুরুত্ব দিচ্ছিলেন এমন নয়। ***নিউ ডিল* যুগের সমাজবাস্তবতার পর আমেরিকান বিমূর্ত শিল্পের উত্থান-যে একটি বড়ো ঘটনা, এ-কথা তখন অনেকে বলছিলেন।** রোজেনবার্গের সহকর্মী ও প্রতিদ্বন্দ্বীরা, বিশেষ করে গ্রিনবার্গ, এই শিল্পীদের শিল্প-ইতিহাসের পরবর্তী ধাপ হিসেবে দেখছিলেন। **চিত্রকলা যেন-বা ছবি নির্ভরতা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে খাঁটি আকৃতি ও রংয়ের স্বাধীনতার দিকে এগোচ্ছে।** অল্প সময়ের মধ্যে বিমূর্ত শিল্পীরা, বিশেষ করে পোলক, সেলিব্রেটিতে পরিণত হন। একধরনের বিদ্রোহী নায়কের প্রতিমূর্তি দাঁড়িয়ে যায় তাঁর। বিমূর্ত শিল্পীদের কঠিন ভঙ্গি, আক্রমণাত্মক তুলির আচড় ও রং ছিটানোর কৌশল যেন শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। *The New York Times*-এর রক্ষণশীল সমালোচকদের রাগান্বিত প্রতিক্রিয়া তাঁদের বিদ্রোহী আভাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমেরিকান বিমূর্ত শিল্প নিয়ে রোজেনবার্গ এমন একটি অবস্থান নিলেন যা গ্রিনবার্গের রূপ-নান্দনিক প্রশংসা, গণমাধ্যমের তৈরি করা মিথ, কিংবা রক্ষণশীলদের বিভ্রান্ত প্রত্যাখ্যান থেকে আলাদা। গ্রিনবার্গের বিপরীতে গিয়ে, এমনকি কখনো কখনো যেন একাডেমিক বোজ-আর্টের পুরনো দিনের জন্য নস্টালজিক কোনো প্রতিক্রিয়াশীলের মতো

শোনালেও, রোজেনবার্গ জোর দিয়ে বলেছিলেন,— এই বিমূর্ত শিল্পকে আর ঐতিহ্যগত অর্থে 'শিল্প' হিসেবে বোঝা যায় না। **তাঁর মতে, এটি শিল্প-ইতিহাসের কোনো নতুন বা সর্বশেষ ধাপ নয় বরং এর অস্তিত্বই প্রমাণ করে শিল্প-ইতিহাস মৃত, যেমন মৃত মার্কসবাদ, জাতীয়তাবাদ ও উদারবাদের মতাদর্শ।** কেউ কেউ হয়তো এখনো উনিশ শতকের বিশ্বাস ও পরিচয়ে মুগ্ধ, কিন্তু সেগুলো আর ব্যক্তি বা সামষ্টিক কর্মকাণ্ডের জন্য পথ উন্মোচন করে না। 'আধুনিক শিল্প', তিনি ঘোষণা দিলেন, কেবল এক 'বিপ্লবের কমেডি মাত্র।' এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি আধুনিক শিল্পকে যুক্ত করেন সেই সব ভুয়া বিপ্লবের সঙ্গে, যেগুলোর মাধ্যমে একসময় ইউরোপের শ্রমজীবী মানুষ চরম বাম ও চরম ডানপন্থী শক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। একইসঙ্গে তিনি এর তুলনা টানেন নেপোলিয়ন তৃতীয়ের প্রহসনের সঙ্গে, যিনি নিজের চাচা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন ও কৃতিত্ব নকল করার ব্যর্থ ও হাস্যকর চেষ্টা করেছিলেন।

যেহেতু, তিনি আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, পপুলার ফ্রন্টের স্বপ্ন, অর্থাৎ চিত্রকলা ও বামপন্থা একসঙ্গে দমনমূলক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। **রোজেনবার্গ তথাপি এই প্রাক-মার্ক্সবাদী বিভ্রমে ফেরত যেতে চাননি-যে,— শিল্পের ইতিহাস রাজনীতির ইতিহাস থেকে আলাদা।** শিল্পী এক সাহসী, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যিনি ক্রমশ আরও অস্বচ্ছ ও দমনমূলক পৃথিবীর মধ্যে দৃঢ়ভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারেন;— এই রোমান্টিক ধারণাকেও তিনি একইভাবে সন্দেহ করছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গিটি যদিও একধরনের আশা তৈরি করত; রাজনৈতিক সম্ভাবনা ভেঙে পড়লেও মানুষ হয়তো এখনও নিজেকে তৈরি করার পদ্ধতিগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, যার সাহায্যে তারা দৈনন্দিনতা, ক্লিশে ও বিভ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, এবং হয়তো একদিন রাজনৈতিক জীবনকেও পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হবে।

'অ্যাকশন'-এর মাধ্যমে একটি নতুন 'পরিচয়' গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায়, বিশিষ্ট শিল্পীরা দেখাতে পারেন-যে আমাদের সকলের মধ্যেই ব্যক্তিগত বিদ্রোহের ক্ষমতা আছে এবং সেই ক্ষমতার প্রতি সাড়া দিয়ে তাঁদের চারপাশে গড়ে উঠতে পারে একধরণের 'আসল দর্শকগোষ্ঠী', যারা নতুন সৃজনশীল নীতির প্রতি সংবেদনশীল। কিন্তু রোজেনবার্গ সতর্ক করেছিলেন,— অত্যন্ত ভয়াবহ ঝুঁকি রয়েছে এখানে। এই ছোট পরিসরের প্রতীকী প্রতিবাদ সহজেই পরিণত হতে পারে একধরনের ধর্মীয় আন্দোলনে,— একটি দলে; যেখানে কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে পূজ্য, আর বিশেষজ্ঞদের এক 'যাজক-শ্রেণি' তাদের ঘিরে বাড়িয়ে তোলে এক নতুন অভ্যন্তরীণ সম্প্রদায়, যা শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় সেসব ছোট-বড়ো সমাজতান্ত্রিক সাময়িকীর পাঠক-লেখকদের মতোই বিভ্রান্ত ও আত্মপ্রবঞ্চিত। **বর্ধমান শিল্পবাজার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 'রুচির আমলাতন্ত্র' যে-বিমূর্ত শিল্পকে গ্রাস করে নেবে, এটি ছিল রোজেনবার্গের সবচেয়ে বড়ো উদ্বেগের বিষয়।** তিনি সন্দিহান ছিলেন এই ব্যাপারে,— একাকী শিল্পীর 'ব্যক্তিত্ব-মিথ' সত্যিই কি প্রতিরোধের উৎস, নাকি আরেকটি ফাঁদ,— যার মাধ্যমে শিল্পীরা নিজেকে সহজে বাজার ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে সঁপে দেবে?

পরবর্তী কয়েক দশক ধরে, ১৯৭৮ সনে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত রোজেনবার্গ চেষ্টা করে গেছেন আমেরিকান বিমূর্ত শিল্পকে সেই নাজুক সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করতে। একে তিনি মনে করতেন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের বিরল ক্ষেত্র। **তিনি একে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন শিল্প-বিরোধীদের কাছ থেকে, ভুলপথে পরিচালিত সমর্থকদের থেকে, এমনকি মিডিয়া ও দ্রুত বেড়ে ওঠা শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্ভর আমলাতন্ত্রের হাত থেকেও।** তাঁর সবচেয়ে গভীর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কিছু লেখা ছিল তাঁর পুরোনো বন্ধু বার্নেট নিউম্যানকে নিয়ে। যুদ্ধোত্তর আমেরিকান বিমূর্ত শিল্পীদের প্রথম দিককার যে-তরঙ্গ সমালোচক ও বাণিজ্যিক সফলতা অর্জন করেছিল, যেমন পোলক ও দে কুনিং, তাঁদের তুলিতে ছিল নাটকীয় আচড়, যেন শিল্পীর শক্তিশালী ও অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। বিপরীতে, নিউম্যানের ছবিগুলো ছিল একেবারেই ভিন্ন। তারা অতিরিক্ত সংযত ও প্রায় নিস্পৃহ। তাঁর সমসাময়িকদের 'অঙ্গভঙ্গিমা নির্ভর' আঁকার একমাত্র স্মারক ছিল ক্যানভাসের মাঝে টানা একটি সরল রেখা, যাকে তিনি রসিকতার ছলে 'জিপ' বলতেন। নিউম্যান ১৯৭০ সালে মারা যান, ঠিক তার আগেই তাঁর কাজ জনপ্রিয় হতে শুরু করে মিনিম্যালিজম ও কালার ফিল্ড পেইন্টিংয়ের নতুন প্রজন্মের শিল্পী ও সমালোচকদের কাছে, যেমন কেনেথ নোল্যান্ড। **পোলক ও দে কুনিং-এর 'নায়কোচিত ভঙ্গি' ও**

‘অভিব্যক্তিপূর্ণ আঁকাআঁকি’তে ক্লান্ত এই নতুন শিল্পীরা নিউম্যানকে ঘোষণা করলেন তাঁদের ধারা বা রুচির এক পূর্বসূরি হিসেবে।

বিভিন্ন প্রবন্ধ ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত একটি মনোগ্রাফে নিউম্যানের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় রোজেনবার্গ চেষ্টা করেছিলেন। একদিকে তাঁর আরও খ্যাতিমান সমসাময়িক শিল্পীদের থেকে, অন্যদিকে তাঁদের থেকেও, যারা নিউম্যানকে নিজের শিল্প-ঐতিহ্যের পূর্বপুরুষ বলে দাবি করছিল। **প্রথম দলের পক্ষাবলম্বীরা, রোজেনবার্গের ভাষায়, নিউম্যানের ‘মৌলিকতা’ উপেক্ষা করেছিলেন; আর দ্বিতীয় দলের অনুসারীরা উপেক্ষা করেছিলেন তাঁর ‘দর্শন’;— যা চেয়েছিল এমন এক যুগে দর্শকের মধ্যে ‘উচ্চমার্গীয় অভিজ্ঞতা’ জাগিয়ে তুলতে, যখন প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস প্রায় লুপ্ত।** নিউম্যান তাঁর অনেক কাজের শিরোনামে ধর্মীয় ইঙ্গিত ব্যবহার করেছিলেন যেমন *The Stations of the Cross* (১৯৫৮-৬৬) কিন্তু শিল্পকর্মগুলোতে দৃশ্যমান ধর্মীয় প্রতীক ছিল না।

রোজেনবার্গের মতে, নিউম্যানের এই পদ্ধতি ছিল একধরনের সচেতন ‘সাধুসুলভ সরলতা’ (deliberate naivete)। চারপাশের প্রচলিত মতামত বা রুচি যাই থাকুক, নিউম্যান সবসময় বেঁচে ছিলেন তাঁর নিজের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে। তিনি তাঁর কাজের অর্থ— এমনকি জীবনকেও দাঁড় করিয়েছিলেন এই আপাত-উদ্ভট ধারণার ওপর- যে,বারবার আঁকা ডোরা যুক্ত আয়তক্ষেত্র দেখেই দর্শক ফিরে পেতে পারে সেই গভীর, উচ্চাকাঙ্ক্ষী থিমগুলোর স্পর্শ, যেগুলো অতীতের ধর্মীয় শিল্পকে অনুপ্রাণিত করেছিল। **নিউম্যান মনে করতেন পূর্বেকার সেই পবিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুনভাবে সংযোগ স্থাপন করার একমাত্র উপায় হলো বিমূর্ততার কৌশলকে একধরনের সংযমী পরিশুদ্ধতা (ascetic purification) হিসেবে ব্যবহার করা, যা শিল্প-ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে দর্শককে নিয়ে যায় ‘নান্দনিকতার সীমা ছাড়িয়ে একধরনের বিশ্বাসের ক্রিয়ায়’;— এমন এক সুন্দর অনুভূতিতে, যার জন্য ধর্মতত্ত্ব, মতাদর্শ, আচার বা নিয়মের কোনো প্রয়োজনই নেই।**

রোজেনবার্গ স্বীকার করেছিলেন, এটি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ চিন্তা। এতে শিল্প-সমালোচকরা অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, কারণ নিউম্যান যেন বলছিলেন : শিল্প-সমালোচনা, এমনকি ‘শিল্প’ বিভাগটিই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর লক্ষ্য পিকাসো, পোলক বা নোল্যান্ডের মতো ছিল না, বরং বেশি মিল ছিল বাইবেলে চিত্রিত নবিদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। **কিন্তু রোজেনবার্গের মতে এটি ছিল ‘অ্যাকশন’-এর প্রকৃত স্বরূপ;—** প্রচলিত নিয়ম ভেঙে ফেলা; শিল্পকে নিজের বিপরীতে দাঁড় করানো; পুরোনো ঐতিহ্য বা নতুন ট্রেন্ডের দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করা; এবং সেই ভয়ানক ঝুঁকি নেওয়া-যে, শেষপর্যন্ত হয়তো নিজের কাজই শুধু নয়, নিজের জীবনও ব্যর্থ বিবেচিত হতে পারে।

রোজেনবার্গের লেখায় বার্নেট নিউম্যান যেমন একধরনের ধর্মনিরপেক্ষ সন্তরূপে আবির্ভূত হন, অ্যান্ডি ওয়ারহল সেখানে যেন জুদাস বা শয়তানসদৃশ চরিত্রের মতো উপস্থিত। ১৯৬০-এর দশকে নিউইয়র্কের শিল্পজগৎ যখন দ্রুত পপ আর্টের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে, রোজেনবার্গ তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এই প্রবণতাকে। তাঁর অভিযোগ ছিল, শিল্পীরা ক্রমেই অভিজাত শ্রেণি, সেলিব্রেটি সংস্কৃতি ও পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে আপস করে ফেলছেন; এমনকি স্বেচ্ছায় সেই ব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠছেন তাঁরা। ওয়ারহল রোজেনবার্গের *The American Action Painters*-এ করা অন্ধকার ভবিষ্যদ্বাণীকে যেন সত্যে পরিণত করেছিলেন। **ওয়ারহল দেখিয়ে দিয়েছিলেন, শিল্পজগতে কোনো শিল্পবস্তুর মূল্যায়ন আদৌ শিল্পকর্মের ভেতর থেকে আসে না, বরং শিল্পীকে ঘিরে কতটা মনোযোগ, প্রচার আর গুঞ্জন তৈরি করা যায়... তার ওপর মূল্যায়ন নির্ভর করে।** অর্থাৎ, শিল্পের মানও প্রোগ্রাম করা যায়, যদি শিল্পী নিজে হয়ে ওঠে একধরনের মিডিয়া-ইভেন্ট।

একসময় শিল্পীর ব্যক্তিত্ব গড়া ছিল এক কঠিন ও প্রায় নৈতিক সংগ্রাম, যার মধ্য দিয়ে তিনি দমনমূলক সমাজব্যবস্থা ও মানববিমুখ অর্থনীতির ভেতর থেকেও কিছু স্বাধীনতা আদায় করতে পারতেন। কিন্তু ওয়ারহলের যুগে সেই ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজ নেমে এলো নিছক মিডিয়া-দক্ষতায় ও ‘পুঁজি সঞ্চয়ের’ কৌশলে। ব্যক্তিত্ব আর প্রতিরোধের ফল নয়, এটি

বরং বাজারে টিকে থাকার অস্ত্র। এ-কারণেই ওয়ারহলের প্রতি রোজেনবার্গের বিরাগ ছিল তীব্র। এই বিরাগ পরবর্তী প্রজন্মের অনেক শিল্পসমালোচক ও শিল্প-ইতিহাসবিদের চোখে রোজেনবার্গকে অবশ্য খুব একটা আকর্ষণীয় করে তোলেনি। **তাঁদের কাছে ওয়ারহলের জ্যাকলিন কেনেডির প্রতিকৃতি কিংবা ডলার চিহ্নের পুনরাবৃত্তি ছিল পুঁজিবাদী সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করার অভিনব কৌশল;—** কখনো তা দেখা হয়েছে সূক্ষ্ম বিদ্রুপ হিসেবে, কখনো আবার অন্তর্লীন সমালোচনা হিসেবে। **তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে।** যেমন রোজেনবার্গ কখনো বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না, তেমনি তিনি জনপ্রিয় সংস্কৃতি বা উত্তর-আধুনিক শিল্পেরও অন্ধ বিরোধী ছিলেন না। **তাঁর আপত্তি ছিল শিল্পের ভেতরের খেলা নিয়ে নয়, তাঁর আপত্তি ছিল সেই জায়গায়, যেখানে শিল্প পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে বাজার, খ্যাতি আর ক্ষমতার হাতে; এবং 'অ্যাকশন' কেবল দৃশ্যমানতা ও সাফল্যের একটি কৌশলে পরিণত হয়।**

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়, উদাহরণ হিসেবে রোজেনবার্গ বিশেষভাবে প্রশংসা করেছিলেন সল স্টেইনবার্গকে, যিনি নিয়মিত *দ্য নিউ ইয়র্কার-এ* আঁকতেন, এবং যাঁর বিখ্যাত কাজ *View of the World from 9th Avenue* ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছিল। মূলধারার একটি পত্রিকায় তাঁর এই দৃশ্যমান সাফল্য এবং 'কার্টুন' নামের তুলনামূলকভাবে হালকা বিবেচিত মাধ্যমে কাজ করার কারণে, রোজেনবার্গের মতে, তাঁর অনেক সমসাময়িক স্টেইনবার্গকে ভুল বুঝেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, তিনি বুঝি কেবল একজন রসিক চিত্রকর, যাঁর কাজ মূলত মজার ছবি আঁকায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু রোজেনবার্গ দেখালেন, এই ধারণা ছিল গভীরভাবে ভ্রান্ত। **তাঁর মতে, স্টেইনবার্গ আসলে নিজের শর্তে, নিজের পথে, 'অ্যাকশন'-এর এক নতুন রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন।** তাঁর কাজের আসল বিষয়বস্তু ছিল কৌতুক নয়, ছিল 'স্টাইল' স্বয়ং। আরও স্পষ্ট করে বললে বিভিন্ন শৈলী কীভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি চিত্রভিত্তিক আত্মজীবনী তৈরি করে, যা একইসঙ্গে শিল্পীর সত্তাকে প্রকাশ করে আবার আড়ালও করে। অর্থাৎ, স্টাইল এখানে নিছক বাহ্যিক রূপ নয়, তা বরং আত্মপ্রকাশের জটিল কৌশল।

চিত্র : সল স্টইনবার্গের আঁকা 'View of the World from 9th Avenue';
দ্য নিউ ইয়র্কার-এর প্রচ্ছদের জন্য প্রস্তুতকৃত (২৯ মার্চ ১৯৭৬)

মূলধারার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই স্টেইনবার্গ এই অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। ইতিহাসের নানা রেফারেন্স, প্রচলিত সাংস্কৃতিক প্রবণতা ও জনপ্রিয় রুচির মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন তিনি, কিন্তু সেগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করতে নয়। **তাঁর লক্ষ্য ছিল কাঠামোগুলোকে ভেতর থেকে নড়বড়ে করে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া।** প্রতিষ্ঠানের বাইরে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ করার বদলে তিনি প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই পরীক্ষার জায়গা তৈরিতে কাজ করছিলেন। কৌশলটি ছিল প্রায় ঠিক উলটো পথে হাঁটার মতো, যা রোজেনবার্গ *The American Action*

Painters-এ বিশ্লেষণ করেছিলেন; যেখানে একাকী, বিচ্ছিন্ন শিল্পী সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত বিদ্রোহের ভঙ্গি গ্রহণ করে।

অনেক দিক থেকে স্টেইনবার্গের এই পথ ওয়ারহলের কৌশলের কাছাকাছি ছিল, যদিও উদ্দেশ্য ও নৈতিক অবস্থানে তাঁদের মধ্যে গভীর পার্থক্য রয়ে গেছে। রোজেনবার্গ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন। যদি সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি অস্বীকার করে একা দাঁড়ানো শিল্পীর ভঙ্গি, আর গণসংস্কৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখা স্বাধীনচিন্তার বুদ্ধিজীবীর ভঙ্গি... এই দুই অবস্থানই শেষপর্যন্ত এক ব্যর্থ উদারনৈতিক ব্যবস্থার প্রতারণামূলক মুখোশে পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে কি সত্যিই প্রতিরোধের পথ সমাজের বাইরে কোথাও রয়েছে? **নাকি প্রকৃত সমাধানটি লুকিয়ে আছে ভেতরেই, সেই কাঠামোগুলোর মধ্য দিয়েই 'অ্যাকশন'-এর নতুন পথ খুঁজে বের করার মধ্যে, যেগুলো প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের কর্মক্ষমতাকে রুদ্ধ করে বলে মনে হয়?**

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি রোজেনবার্গের দীর্ঘদিনের এক অনুসন্ধানে হঠাৎ করেই নতুন মাত্রা নিয়ে আসে। তিনি খুঁজছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, এমন এক ভঙ্গি, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ভেতরে গেঁথে থাকা পরিকল্পিত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতারণার বিরুদ্ধে সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। জনসন ও নিক্সন প্রশাসন বছরের-পর-বছর ধরে জনসাধারণকে সচেতনভাবে বিভ্রান্ত করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলা এই ভয়াবহ, নিষ্ফল যুদ্ধের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে। এই মিথ্যাচার কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে আসেনি, এতে সক্রিয় সহযোগিতা ছিল গণমাধ্যমের ও সেইসব একাডেমিক 'বিশেষজ্ঞদের', যারা প্রতিরক্ষা দপ্তর ও নানা থিংক-ট্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করে রেখেছিলেন। রোজেনবার্গ একটুও স্বস্তি পাননি এই ভেবে-যে, শেষপর্যন্ত কিছু পেশাদার সাংবাদিক গালফ অব টঙ্কিনের সাজানো ঘটনাটি ফাঁস করেছিলেন কিংবা নিক্সনের গোপন কারসাজি উন্মোচিত হয়েছিল। **কারণ, তাঁর মতে সমস্যাটি কেবল কয়েকটি মিথ্যার নয়। মিথ্যা তখন এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং এত নিখুঁতভাবে সত্য অথবা বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল, সাধারণ মানুষের পক্ষে আর বোঝাই সম্ভব হচ্ছিল না আসলে কী ঘটছে!** এই অবস্থায় রোজেনবার্গ মনে করেছিলেন মার্কিন জনগণের জন্য 'বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো বস্তুনিষ্ঠ ধারণা গড়ে তোলা' প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সত্য আর অসত্যের সীমারেখা এমনভাবে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, বাস্তবকে চিনে নেওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি ভেঙে পড়ছিল।

রোজেনবার্গ মনে করতেন, জনসাধারণ কেবল কিছু নির্দিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক বা শিক্ষাবিদের ওপর আস্থা হারায়নি, বরং এই ভূমিকাগুলো যারা দখল করে আছে, তাদের সবার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে, এবং তা ছিল সম্পূর্ণ যৌক্তিক। সমস্যাটি কিন্তু তৈরি হয়েছিল অন্য জায়গায়। বিশ্বাসভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল একধরনের উদাসীনতা ও নিরাসক্তির দিকে;— এক মানসিক শূন্যতায়, যেখানে কিছুই আর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। এক প্রজন্ম আগে রোজেনবার্গ আশঙ্কা করেছিলেন, জনগণ ও বুদ্ধিজীবীরা খুব সহজেই স্তালিনবাদ, ফ্যাসিবাদ, জাতীয়তাবাদ, খ্রিস্টান রক্ষণশীলতা কিংবা উদারনীতির মোহে পড়ে যেতে পারে। এখন তাঁর ভয় আরও ভিন্ন ও গভীর হলো। **তিনি দেখছিলেন, আমেরিকানরা ন্যায্যভাবেই সংশয়ী হয়ে ওঠার পর হয়তো এমন এক অবস্থায় পৌঁছাবে, যেখানে তারা আর কোনো ধরনের রাজনৈতিক পরিচয় বা সক্রিয় কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস রাখতে পারবে না।** এই পরিস্থিতিকে তিনি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। কারণ, যখন মানুষ আর কিছুতেই বিশ্বাস করে না, তখন তারা শুধু ক্ষমতার প্রতারণা থেকে দূরে থাকে না,— নিজেদের কর্মক্ষমতা থেকেও সরে যায়। এই আবহে রোজেনবার্গ জোর দিয়ে বলেছিলেন, আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন লেখকদের (শিল্পীদের মতোই) দায়িত্ব আরও বেশি। **তাঁদের দেখাতে হবে-যে অ্যাকশন মানে কেবল পরিকল্পিত কর্মসূচি নয়, বরং এমন এক ক্ষেত্র যেখানে সবসময়ই অপ্রত্যাশিত কিছু জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।** অর্থাৎ, যখন সব পথ বন্ধ বলে মনে হয়, ঠিক তখনই সত্যিকারের কর্মের ভেতর লুকিয়ে থাকে নতুন কিছু ঘটার সম্ভাবনা।

রোজেনবার্গের মতে, বুদ্ধিজীবীদের সামনে কর্মের পথ এখন খুব সীমিত। সেই পথগুলোর একটি হলো বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের দাবি একপাশে সরিয়ে রেখে নিজের চোখে দেখা বাস্তবতার প্রতি ব্যক্তিগত ও প্রভাবশালী এক ধরনের স্টাইলের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানানো। এখানে শীতল, নিরপেক্ষ অনুসন্ধান বা দূরত্ব বজায় রাখা বিশ্লেষণের আর কোনো কার্যকারিতা নেই। তার বদলে প্রয়োজন সৎ ঘৃণা, স্পষ্ট ক্ষোভ ও অস্বস্তি গোপন না করে প্রকাশ করার সাহস। **'বিশেষজ্ঞ'র মুখোশ পরে নিজেকে নিরপেক্ষ তথ্যের ওস্তাদ হিসেবে উপস্থাপন করা আজ আর কাজের নয়। কারণ, জনগণ এই ভূমিকাটির ওপরই বিশ্বাস হারিয়েছে।** তারা আর সেই কণ্ঠ শুনতে চায় না, যে-কণ্ঠ নিজেকে আবেগহীন, সর্বজ্ঞ ও বাস্তবতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করে। জনগণের কাছে পৌঁছাতে চাইলে বুদ্ধিজীবীকে পারিবারিক টেবিলের আড্ডায় অংশগ্রহণকারী একজনের মতো হতে হবে। **তাকে কথা বলতে হবে সরাসরি ও সহজভাবে; যদিও সেই ভাষা হতে পারে অসাধারণ উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ।** আলোচনার বিষয় হতে হবে সেইসব অভিজ্ঞতা, যা আমরা সবাই দেখি, অনুভব করি, কিন্তু প্রায়শ প্রকাশ করতে পারি না। **রোজেনবার্গ অর্ধশতাব্দী আগে সতর্ক করেছিলেন,— যে-যুগ আর সত্যে বিশ্বাস রাখে না, সেই যুগে বুদ্ধিজীবী যদি পুরোনো গাম্ভীর্য ও দূরত্ব আঁকড়ে ধরে থাকে, তবে সে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।** এমন সময়ে বুদ্ধিজীবীকে একধরনের জনমুখী চরিত্র হয়ে উঠতে হবে, যেমন শিল্পী হয়ে উঠতে পারে একধরনের কৌতুকাভিনেতা।

স্টাইনবার্গ, ওয়ারহল, নিউম্যান অথবা যুদ্ধ-পরবর্তী বিমূর্ত শিল্পীদের সম্পর্কে রোজেনবার্গ 'সঠিক' ছিলেন কি-না, অর্থাৎ তাঁর কথাগুলো কি সত্যিই আমাদের সেই শিল্পীদের কাজ ও তাৎপর্য আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে কি-না, তা শেষপর্যন্ত শিল্পকর্মগুলোর প্রতি নিজের সরাসরি দৃষ্টিপাতের নিক্তিতে পাঠককেই বুঝে নিতে হবে। রোজেনবার্গের সমালোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তিনি যখন এক শিল্পী থেকে অন্য শিল্পীর দিকে নজর ফেরাতেন, তখনও একটি বিষয়ে অটল থাকতেন : কোনো শিল্পীর কাজ কি আমাদের দেখাতে পারে, কীভাবে আধুনিক সমাজে একজন ব্যক্তি বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতর থেকে নিজের পুরোনো পরিচয়ের সীমা ভেঙে আরও বিস্তৃত ও স্বাধীন নতুন আত্মপরিচয় গড়ে তুলছেন? **দশকের-পর-দশক শিল্প নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি একই মানদণ্ড ধরে রেখেছিলেন : শিল্পীকে বিচার করতে হবে তিনি 'কর্ম' (action) করতে পেরেছেন কি-না।** অর্থাৎ, তিনি কি রুটিন, ক্লিশে, আনুগত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেন? আত্মপ্রবঞ্চনা ও কল্পনার ভ্রান্ত পলায়নের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছেন? এই দুই বিপদ রুটিন-ক্লিশে ও আত্মপ্রবঞ্চনামূলক কল্পনা... রোজেনবার্গের মতে পুঁজিবাদী সমাজের প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয়। নিজের এই দাবি থেকে তিনি কখনও সরে আসেননি।

শিল্প-সমালোচক বা শিল্প-ইতিহাসবিদদের খুব কমই রোজেনবার্গের এই 'কর্ম' বা *action* কেন্দ্রিক ধারণাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বা বুঝতে পেরেছেন-যে, এটি আধুনিক বিশ্বের এক গভীর সমালোচনার সঙ্গে যুক্ত। তবে বন্ধু হানা আরেন্ট তাঁর বহু ধারণাকে তুলে নিয়েছিলেন *The Human Condition (1958)* বইয়ে। সেখানে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক জীবন যেমন, নান্দনিক জীবনও তেমনই একটি সহজাত অথচ এখন বহুলাংশে উপেক্ষিত মানবিক চাহিদা দ্বারা চিহ্নিত : আত্মপ্রদর্শন, পারফরম্যান্সের মাধ্যমে, যা শ্রম নয়, রুটিন নয়, আচার নয়, **বরং তিনি রোজেনবার্গকে অনুসরণ করে বলেছিলেন,— 'অ্যাকশন'।**

তাঁর বন্ধুর মতোই আরেন্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন-যে, আমাদের সমাজে কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনাগুলো একদিকে যান্ত্রিকতা ও আমলাতন্ত্রে, অন্যদিকে ভুয়া ছদ্ম কর্মকাণ্ডে ক্ষয়ে যাচ্ছে; যেমন, বিনোদনশিল্পের মনোশূন্য আনন্দ অথবা গণ-রাজনীতির বিভ্রমময় উত্তেজনা। **তাঁর চিন্তার এক মোড় ফেরানো প্রবন্ধ *The Crisis in Culture* (১৯৬০)-এ আরেন্ট রোজেনবার্গকে উদ্ধৃত করে বলেন : আজকের বুদ্ধিজীবীর কাজ হলো গণসংস্কৃতিকে বাইরে থেকে সমালোচনা করা নয়, বরং তার মধ্যেই 'রুচি' ও 'বিচারবোধ' চর্চা করা; অর্থাৎ, রোজেনবার্গের উদাহরণ অনুসরণ করে বুদ্ধিজীবীকে হতে হবে একধরনের জনসম্পৃক্ত চিন্তক (public intellectual)**।

১৯৭৯ সনে রোজেনবার্গের মৃত্যুর এক বছর পর তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার দেখভালের দায়িত্বে থাকা মাইকেল ডেনেনি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর ছাত্র-পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি ১৯৬০-র দশকের শেষভাগ ও ১৯৭০ দশকের শুরুতে রোজেনবার্গ ও হানা আরেন্টের সঙ্গে কাটানো সময়ের কথা স্মরণ করেন। সেই সাক্ষাৎকারে এবং একই বছরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডেনেনি জোর দিয়ে বলেন, আরেন্ট ও রোজেনবার্গ ছিলেন 'অ্যাকশন-এর প্রকৃতি নিয়ে ভাবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক চিন্তাবিদ।' তাঁদের দীর্ঘ বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁদের চিন্তায় একধরনের অনন্য মিলন বা গভীর সাযুজ্য তৈরি হয়েছিল। **ডেনেনির ইঙ্গিত ছিল সম্ভবত অ্যাকশন এবং বিচারবোধ এমন কিছু বিষয় যেগুলোকে কেবল তাত্ত্বিক ভাষায় পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না**। এগুলোকে আসলে বোঝা যায় বাস্তব, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই,— কীভাবে কেউ কথা বলে, সিদ্ধান্ত নেয়, অবস্থান নেয়, ঝুঁকি নেয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রোজেনবার্গ ও আরেন্টের সবচেয়ে বড়ো অবদান কোনো সম্পূর্ণ তত্ত্ব বা বন্ধ-কাঠামো নয়। বরং তাঁদের প্রকৃত অবদান হলো সেই জীবন্ত উদাহরণ যেটি তাঁরা তৈরি করেছিলেন প্রকাশ্য লেখালেখি, শ্রেণিকক্ষ, ছাত্র, আর বন্ধুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে। সেখানে আমরা দেখি কীভাবে তাঁরা অবিরাম চেষ্টা করেছেন সতর্ক, চিন্তাশীল ও সৎভাবে বিচার করতে। এমন এক সময়ে, যখন বিচার করার পুরোনো মানদণ্ড, ঐতিহ্যের ভিত্তি, এমনকি রাজনৈতিক বিশ্বাসের নিশ্চিত আশ্রয়গুলো ভেঙে পড়ছিল বা সন্দেহের মুখে পড়েছিল। এই অর্থে তাঁদের জীবন ও কাজ স্বয়ং ছিল একধরনের 'অ্যাকশন';— অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভাবতে থাকা, কথা বলতে থাকা, এবং দায় নিয়ে বিচার করার নিরলস এক প্রচেষ্টা।

. . .